Vol. 54 | No. 1 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

পশ্চিমবঙ্গের নাটক

Volume	54
Issue	1
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৌমিত্র বসু
Published online	October 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v54i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v54i1.1
Pages	১-১০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

পশ্চিমবঙ্গের নাটক

সৌমিত্র বসু*

সারসংক্ষেপ : বাংলা নাটকের স্মরণীয় পথযাত্রায় পশ্চিমবঙ্গের অবদান ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। কলকাতাকে কেন্দ্র করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে ইউরোপীয় নাট্যধারা অবলম্বনে নাট্যরচনার যে সূত্রপাত তা বিংশ শতাব্দীতে হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক শিল্পমানস্পর্শী। ভারত-বিভাগের পরবর্তী পর্যায়ে এই নাট্যধারা হয়ে ওঠে আরও বেগবান। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গকেন্দ্রিক বাংলা নাটক কীসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে তা সংক্ষিপ্ত পরিসরে এই প্রবন্ধে পরিবেশন করা হয়েছে।

সাহিত্যের অন্য যে কোনো সংরূপের তুলনায় নাটক এবং গান খানিকটা আলাদা। যে কোনো শিল্পকেই দ্বিজ বলা যেতে পারে, স্রষ্টার মন থেকে একবার জন্মের পরে সে আর একবার নতুন জন্ম নেয় তার গ্রাহকের মনে। কিন্তু নাটক আর গান সেই বহু একক মানুষের হৃদয়ে জন্মলাভের আগে আর একবার জন্মায় অন্য একদল স্রষ্টার সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। তখন তা আর সাহিত্য থাকে না। গানের সাহিত্য-অংশটুকুর সঙ্গে যখন জড়িয়ে যায় স্রষ্টার নিজের অথবা অন্য একাধিক মানুষের তৈরি করা সুর, বাজনা, গায়নভঙ্গি, তখন যেমন তাকে আর কবিতার পরিধিতে আমরা আটকে রাখতে পারি না, তেমনি উচ্চারণযোগ্য ভাষায় রচিত নাটক যখন প্রযোজনার জন্মান্তর পায়, তখন সে হয়ে দাঁড়ায় নাট্য, শুধু সাহিত্যের আওতায় তাকে বেঁধে রাখা সম্ভব হয় না। আমাদের এই আলোচনায় অবশ্য নাটকের সাহিত্যরূপ আর তাদের নাট্যরূপ নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হবে না, কিন্তু যিনি নাটক লেখেন তিনি জানেন, নাটককারের পক্ষে প্রযোজনার চিন্তা ভুলে গিয়ে কেবলমাত্র সাহিত্য হিসেবে নাটক লেখা অসম্ভব যদি বা নাও হয়, খুবই বিরল ঘটনা। সাহিত্য হলো একজন মানুষের উপভোগের সামগ্রী, আর নাট্য উপভোগ করেন বহু মানুষ একসঙ্গে মিলে। অনেক মানুষের মনের মতো হবার দায় আছে বলেই নাটকের গঠনে ভাঙচুরের প্রবণতা অন্য সাহিত্য সংরূপের তুলনায় কম থাকে, আমজনতা দর্শকের নিঃশ্বাস সব সময় ঘাড়ের

*অধ্যাপক, নাটক বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ওপর পড়ে বলেই বিষয়বস্তুতে নতুন আলো-হাওয়া আনার ব্যাপারে তার আড়ষ্টতা অন্য সাহিত্য সংরূপের তুলনায় অনেক বেশি।

স্বাধীনতার পর থেকে অর্ধ শতক জুড়ে লেখা হয়েছে অজস্র নাটক, একটি ছোট নিবন্ধে তাদের সামগ্রিক পরিচয় নিশ্চয় কেউ আশা করছেন না। তার বাইরেও, নাটকের ইতিহাস লেখার আর দু একটি গুরুতর অসুবিধের কথা পেশ করা দরকার। সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি, তার সবই প্রায় ছাপার হরফে স্থায়ী রূপ নিয়ে আছে, সেই সব লেখার মধ্যে যারা প্রতিনিধিস্থানীয় তাদের খুঁজে বার করা খুব কঠিন হতে পারে, কিন্তু অসম্ভব হয়তো নয়। বিপরীতে, নাটক যাঁরা লেখেন, ছাপার হরফে প্রকাশিত হওয়াকেই তাঁরা মোক্ষ বলে মনে করেন না সাধারণত, তাঁদের মনে থাকে নাটকটি মঞ্চায়িত হওয়ার ভাবনা। এমনটা হতেই পারে কোনো গুরুত্বপূর্ণ নাটক ছাপাই হলো না শেষ পর্যন্ত, তার একটা দুটো পাণ্ডুলিপি থেকে গেল যারা অভিনয় করেছেন তাঁদের দপ্তরে, হয়তো হারিয়েই গেল। বিশেষ করে পেশাদার থিয়েটারে যে সব নাটক অভিনীত হয়েছে তাদের লিখিতরূপ খুঁজে পাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব কাজ। তত বিখ্যাত হননি এমন নাটককারদের রচনা সম্পর্কেও ওই একই কথা বলা যায়। আর একটি তাত্ত্বিক প্রশ্ন তুলে এ প্রসঙ্গ শেষ করি। নাটককার নিজে যখন নাটক লেখেন, এবং তিনি মনে মনে জানেন এ নাটক তিনিই প্রযোজনা করবেন, তখন লিখিত পাঠে বহু ইঙ্গিত তিনি ছেড়ে রাখতে পারেন। আবার, লিখিত নাটক যখন মঞ্চজন্ম পায় তখন তা মূল পাঠ থেকে অনেকটাই সরে আসে। কখনো তা রচনাকারের অনুমোদন পায়, কখনো পায় না। তাহলে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা নাটক বলতে কোন্ বয়ানটিকে ধরা উচিত হবে? তার লিখিত রূপটি, না তার মঞ্চরূপ? প্রশ্নগুলির সমাধান করার সময় আমাদের হাতে নেই, কেবল উত্থাপন করে আমরা ইতিহাসের দিকে চলে যাই।

সকলেই জানি, বাংলা নাটক রচনাকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করেছে যে মঞ্চায়ন ভাবনা, চারের দশকে তা একটি পর্বান্তরে পৌঁছোল। উনিশ শতকের শেষের দিকে শখের থিয়েটার থেকে এসেছিল পেশাদার থিয়েটার, সেই পেশাদার থিয়েটারকে সরিয়ে দিয়ে জেগে উঠল অপর একটি ধারা, গণনাট্য সংঘকে কেন্দ্র করে। চারের দশকের পেশাদার থিয়েটারে রঙমহল আর শ্রীরঙ্গম মঞ্চে নাটক করছেন অহীন্দ্র চৌধুরী আর শিশিরকুমার ভাদুড়ি; তারাশঙ্কর মৌলিক নাটক লিখতে চাইছেন; মনোজ বসু, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী শচীন সেনগুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য মন্মথ রায় বা মহেন্দ্র গুপ্তের পথ ধরে নাটক লিখতে আসছেন তারাকুমার মুখোপাধ্যায়, নিতাই ভট্টাচার্য প্রমুখরা। কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল, সময়ের স্পন্দনকে মুখ্যত ধরতে পারছে গণনাট্য সংঘই। এ থিয়েটার শৌখিনতায় বিশ্বাস করে না, আবার অর্থ উপার্জনের কথা ভেবে নাট্য উপস্থাপিত হয় না এখানে, কোনো একটা আদর্শকে প্রতিষ্ঠা দেবার লক্ষ্যে সে তার সৃজনের কাজ করতে চায়। চারের দশকে এই আদর্শ তো হতেই হবে রাজনৈতিক আদর্শ, বামপন্থা

যেখানে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের দেশের অবস্থাকে মিলিয়ে দিয়ে যুক্তিসংগত বিশ্লেষণ করতে চাইছে। কিন্তু সেই আদর্শনির্ভর নাট্য আন্দোলনেরও বিপদ ঘনিয়ে এলো। রাজনৈতিক অনুশাসন বনাম শিল্পীর স্বাধীনতার তর্কে গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে এলেন অনেকে, তাঁদের মধ্যে প্রধান যাঁরা, যেমন শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, বিজন ভট্টাচার্য বা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁরাই হয়ে উঠবেন আমাদের আলোচ্য পর্বের প্রধান মুখ। গণনাট্য থেকে তৈরি হলো নবনাট্য, আরো কিছু কিছু অভিধা দেওয়া হলো, কিন্তু ইংরেজি গ্রুপ থিয়েটার নামটিই জনপ্রিয় হয়ে উঠল ক্রমশ। তিনের দশকের গোড়ায় লন্ডনে এবং ন্যুইয়র্কে আলাদা করে দ্য গ্রুপ থিয়েটার নামে দুটি প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়। আমেরিকার এক গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে ছিলেন হ্যারল্ড ক্ল্যারম্যান, শিরিল ক্র্যফোর্ড, লি স্ট্রেসবার্গ প্রমুখ। স্তানিস্লাভ্স্কির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা সংঘবদ্ধভাবে প্রযোজনার কথা ভাবলেন, অভিনেতার নক্ষত্রায়নকে বাতিল করে দিয়ে। আমাদের গ্রুপ থিয়েটার অন্তত নামকরণের সূত্রে এই ভাবনার উত্তরাধিকারী।

অধ্যাপক স্বপন মজুমদার তাঁর *সাত দশকের থিয়েটার ও অন্যান্য* গ্রন্থে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা নাটককে বিষয়ের দিক থেকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলি হলো, ক. স্বাধীনতা-দেশবিভাগ-মন্বন্তর-সাম্প্রদায়িকতা; খ. সামাজিক অন্যায়-অবিচার-বঞ্চনা ও মধ্যবিত্ত জীবন; গ. প্রান্তিক জীবন ও সামাজিক অনন্বয়; ঘ. রাজনৈতিক প্রতিবাদ ও প্রচার; এবং ঙ. অস্তিত্বসংকটের নাটক। লক্ষ করে দেখবেন, প্রতিটি বর্গের নাটকই কোনো না কোনোভাবে বেঁচে থাকার সংকটকে প্রকাশ করতে চায়। চারের শেষে প্রতিষ্ঠিত হল বহুরূপী (১৯৪৮), পাঁচের দশকের শুরুতে আত্মপ্রকাশ করছে লিট্ল থিয়েটার গ্রুপ। ১৯৪৮ সালে তাঁদের প্রতিষ্ঠা বটে, কিন্তু বাংলা ভাষায় নাটক করতে শুরু করলেন ১৯৫৩ থেকে। বিজন ভট্টাচার্যের ক্যালকাটা থিয়েটার ১৯৫১, তরুণ রায়ের থিয়েটার সেন্টার ১৯৫৪, সবিতাব্রত দত্তের রূপকার ১৯৫৫, শ্যামল ঘোষের গন্ধর্ব, পার্থপ্রতিম চৌধুরী ও মনোজ মিত্রের সুন্দরম এবং বীরেশ মুখোপাধ্যায় ও নিবেদিতা দাসের শৌভনিক ১৯৫৭, শেখর চট্টোপাধ্যায়ের থিয়েটার ইউনিট ১৯৫৮, ১৯৬০ সালে তৈরি হল অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নান্দীকার। পাঁচের দশকে পেশাদার থিয়েটারে যখন অভিনীত হচ্ছে সাহেব বিবি গোলাম, এক পেয়ালা কফি, শ্যামলী আরোগ্য নিকেতনের মতো কাহিনিনির্ভর নাটক, স্টার তৈরি করছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রঙ্গগৃহ, মঞ্চে অভিনয় করতে আসছেন উত্তমকুমার বা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের মতো জনসমাদৃত শিল্পীরা।

অন্যদিকে বহুরূপী তখন করছেন চার অধ্যায়, রক্তকরবী, দশচক্র, পুতুল খেলা, যাদের বিষয় আর প্রকাশভঙ্গি পেশাদার থিয়েটারের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। গল্প বলাটাই মুখ্য কাজ নয় সেখানে, নাট্যভাষার নতুন নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করে

আখ্যানের গভীরতম তল থেকে চিরকালীন সত্যকে বার করে আনা, তার সঙ্গে সমকালীন সমাজকে মিলিয়ে দেবার দায়িত্ব পালন করছেন তাঁরা। সে চিরকালীন সত্যের আবিষ্কারে কম্যুনিস্ট পার্টির নির্দেশকে অস্বীকার করে শম্ভু মিত্র প্রাধান্য দিতে চাইছেন ব্যক্তির অনুভবকে, রক্তকরবী ছাড়া বাকি তিনটি নাটককেই বলা চলে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার নাটক। এই ভাবনা অবশ্য অন্য দলগুলির ততটা নয়। লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ করছেন নীচের মহল বা অঙ্গার, যেখানে সমাজের প্রান্তবর্তী মানুষের সামূহিকতার কথা উঠে আসছে। ম্যাক্সিম গোর্কির মানুষ আর বাংলার মানুষ একাকার হয়ে যাচ্ছে সেই কাজে, আবার কুখ্যাত বড়াধেমো কয়লাখনিতে শ্রমিক শোষণের নির্মম ছবি রিপোর্টারের দক্ষতায় খুঁজে বার করে নিয়ে আসা হচ্ছে মঞ্চের ওপর। লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি নামে আত্মকথায় উৎপল স্বীকার করছেন, কয়লাখনিতে শ্রমিকদের মৃত্যুতে নাটক শেষ করা অন্যায় হয়েছে তাঁর, বোঝা যাচ্ছে গণনাট্যের আদর্শ মেনে আশাবাদ প্রচার করাকে তিনি শিল্পীর কাজ বলে মেনে নিয়েছেন। বিজন ভট্টাচার্যের ক্যালক্যাটা থিয়েটার উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে প্রযোজনা করছে গোত্রান্তর। স্বপন মজুমদার বাংলা নাটকের যে প্রবণতাগুলির কথা বলেছেন, তারই অনুবর্তী থেকে এক ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতা কমবেশি সকলের কাজের মধ্যেই দেখা দিতে লাগল। এইভাবেই, নাটকের নির্বাচনে এবং প্রযোজনার ধাঁচে পেশাদার থিয়েটার থেকে ভিন্ন একটি ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল পাঁচের দশকে।

ছয়ের দশক নানা দিক থেকেই বাংলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬২ সালে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন, উত্তর সীমান্তে ভারত-চিন সংঘর্ষ। ১৯৬৪ সালে কম্যুনিস্ট পার্টি ভাগ হয়ে গেল, ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ, ১৯৬৭ সাল থেকে নকশাল আন্দোলন শুরু। পেশাদার থিয়েটারে এই আততিময় সময়ের কোনো ছাপ পড়েনি। সেখানে রঙমহলে অভিনীত হয়ে চলেছে বিভূতিভূষণের আদর্শ হিন্দু হোটেলের নাট্যরূপ, জহর রায় কিছুটা স্থূল হাস্যরসের নাটক আমি মন্ত্রী হব বা মনোর মিত্রের লেখা বাবা বদল করে জমিয়ে দিচ্ছেন, বিশ্বরূপায় তৃপ্তি মিত্র অভিনীত সেতু হাজার রজনী পার করল। তৈরি হচ্ছে কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ, সেখানে অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি বা নটী বিনোদিনীতে জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কেতকী দত্ত সবিতাব্রত দত্তরা জনসমাদর পাচ্ছেন। লক্ষ করবেন, পেশাদার থিয়েটারের এই তালিকায় রবীন্দ্রনাথের কোনো নাটক নেই, অথচ, ১৯৬১ সালে সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে রবীন্দ্র জন্মের একশো বছর। অন্যদিকে, বেশ কিছু নতুন নাট্যদলের জন্ম হচ্ছে এই দশ বছরে, যেমন শ্যামল ঘোষের নক্ষত্র (১৯৬৬), বিভাস চক্রবর্তীর থিয়েটার ওয়ার্কশপ (১৯৬৬), এবং বাদল সরকারের শতাব্দী (১৯৬৭)। লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ ভেঙে গেল, উৎপল দত্ত তাঁর অনুগামীদের নিয়ে তৈরি করলেন পিপ্‌লস লিট্‌ল থিয়েটার (১৯৬৯)। বোঝা যায়, নাট্যপিপাসু মধ্যবিত্ত নাগরিক

বাঙালির একটি অংশ পেশাদার থিয়েটারের বাইরে এই ধরনের প্রযোজনার প্রতি আরো বেশি করে আকৃষ্ট হচ্ছেন।

ছয়ের দশকে অপেশাদার তন্নিষ্ঠ নাট্যকর্মগুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করতে চাই। প্রথমেই বলবার কথা, খুবই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন নাটককার উঠে আসছেন, বাংলা নাট্যসাহিত্যে যাঁরা স্থায়ী আসন করে নেবেন। এঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে চাই বাদল সরকারের, ষাটের গোড়ায় লেখা হলো এবং ইন্দ্রজিৎ, যাকে নাটককার নিজে নাটক বলতে দ্বিধাগ্রস্তই ছিলেন। স্বপন মজুমদার যে অস্তিত্বসংকটের কথা বলেছেন, তার নিদর্শন হিসেবে আসছে তাঁর বাকি ইতিহাস, প্রলাপ, ত্রিংশ শতাব্দী বা পাগলা ঘোড়ার মতো নাটকগুলি, পাশাপাশি লেখা হচ্ছে বেশ কিছু অসামান্য কমেডি, অতি পরিমিত ভঙ্গিতে হাসি তৈরি করেন সেখানে। সাতের দশকে এসে মানুষটি পালটে ফেলবেন নিজের দর্শন, থিয়েটারের অন্য রকম ধাঁচ তৈরি করবেন তিনি, সে কথায় পরে আসা যাবে। বাদল সরকারের তুলনায় তরুণতর দুজন নাটককারও নাট্যরচনা শুরু করবেন পাঁচের দশকের শেষ থেকে, তাঁদের স্ফূর্তি ঘটবে ছয়ের দশকে। এঁরা হলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৪) এবং মনোজ মিত্র (১৯৩৮)। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাও বলা দরকার, মৌলিক নাটক বলতে যা বোঝায় তা তেমন লেখেননি তিনি, কিন্তু তাঁর বঙ্গীকরণের আশ্চর্য ক্ষমতায় চেখফ, ব্রেখট বা পিরানদেল্লোরা দিব্য দেশী হয়ে উঠতে পেরেছেন।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের পক্ষে খুবই সৌভাগ্যের কথা হলো, এঁদের নাটক রচনার ধরন পরস্পরের থেকে অনেকটাই আলাদা। ছয়ের দশকের বাদল সরকার মুখ্যত লিখছেন মধ্যবিত্ত-নাগরিক মানুষের সংকট নিয়ে, সে সংকটের মধ্যে মিশে যাচ্ছে সময়ের ছাপ, মিশে যাচ্ছে ইতিহাসের গূঢ় দোলাচল। কবিতা লেখায় তাঁর আগ্রহ ছিল, তার ছায়া পড়েছে নাটকগুলির ওপরে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন প্রতিষ্ঠিত কবি, কবিতায় বাস্তব বা সম্ভাব্যতাকে ভেঙে দেওয়ার যে ধরন আছে, তাকে তিনি নিয়ে এলেন তাঁর প্রথম পর্বের নাটকে। এই দুজনের লেখাতেই তাই ছয়ের দশকের য়ুরোপীয় অ্যাবসার্ড নাটকের কিছু উপাদান চলে আসছে, যদিও সংজ্ঞা মিলিয়ে অ্যাবসার্ড নাটক এঁদের কারুর রচনাকেই বলা চলবে বলে মনে হয় না। মনে করিয়ে দিতে চাই, ছয়ের দশকে সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্যে নানা ধরনের নিরীক্ষা চলছে, কথাসহিত্যে এসেছে সমরেশ বসুর বিবর, প্রজাপতি, সুনীলের আত্মপ্রকাশ অথবা প্রতিদ্বন্দ্বীর মতো উপন্যাসে দ্বিধাগ্রস্ত, মূল্যবোধে অস্থাহীন এক নতুন সমাজের ছবি ফুটে উঠছে। কবিতায় হাংরি জেনারেশন এসে গেছে, শ্রুতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে অন্য রকম কবিতার আন্দোলন। বাংলা নাটক রচয়িতাদের স্বাতন্ত্র্যকেও এই সামূহিকতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাই।

মনোজ মিত্রকে একটু আলাদা করে ধরতে হবে। মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাট্য প্রযোজনায় আগ্রহ দেখাননি, তিনি শুধুই নাটককার। বাদল সরকার দীর্ঘদিন ধরে দেশে বিদেশে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন, তাঁর দল শতাব্দী তৈরি হল ১৯৬৭ সালে, ছয়ের দশকের শেষে। তার আগে লেখা হয়ে গেছে তাঁর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাটক। অর্থাৎ তিনি আগে নাটককার পরে পরিচালক। অন্যদিকে মনোজ মিত্র পার্থপ্রতিম চৌধুরীর সঙ্গে দল গড়েছেন পঞ্চাশের শেষে, এবং বাধ্য হয়েই তাঁকে নাটক লেখার জন্যে কলম ধরতে হয়েছে। হয়তো সেই কারণেই অন্য দুজনের তুলনায় তাঁর নাটকে দর্শক মনোরঞ্জনের চেষ্টা অনেক বেশি। নিশ্চয় এমন নয় যে তিনি কেবলমাত্র সম্ভাব্যতার মধ্যেই আটকে থাকেন, ভাঙচুরও তাঁর লেখায় কম নেই, কিন্তু তার সঙ্গে তিনি নাটকের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারেন জনপ্রিয়তার বিবিধ উপাদান। এদিক থেকে তাঁকে দেখতে চাইব উৎপল দত্তের পাশে রেখে। উৎপল একের পর এক নাটক লিখে গেছেন, তীব্র রাজনৈতিক প্রচার সেই সব নাটকে, কিন্তু ঘোষিতভাবেই তিনি জনমনোরঞ্জনের সব কটি অস্ত্রকে ব্যবহার করেছেন। মনোজ মিত্রের নাটকে রাজনীতি অত সার্বিক আগ্রাসন নিয়ে আসেনি, কিন্তু দর্শককে আকর্ষণ করার আকাঙ্ক্ষায় তিনি উৎপল দত্তের সঙ্গে তুলনীয়। বাংলা থিয়েটারের পক্ষে খুব বড় ঘটনা হলো, এই দশকের মাঝামাঝি থেকে শম্ভু মিত্র লিখতে শুরু করলেন তাঁর বিশাল নাটক চাঁদ বণিকের পালা। মনসামঙ্গলের কাহিনি কাঠামো সামনে রেখে যার মধ্যে তিনি ভরে দিলেন ষাট আর সত্তরের সমাজ জীবন থেকে উঠে আসা বিবিধ প্রশ্ন, তার সঙ্গে মিলে গেল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সংকট।

১৯৬৮ সালে শুধু নাট্যকলার মানুষজন নন, মূলত শম্ভু মিত্রের উদ্যোগে বাংলার নানা ধরনের শিল্পী এবং ভাবুকগোষ্ঠীকে নিয়ে বাংলা নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি নামে একটি সংগঠন তৈরি করা হল। তাঁদের আবেদনপত্রে বলা হলো, ...এই মূল্যবান পরিহৃত অবস্থার মধ্যে মানুষকে সুস্থ ও সচেতন হতে সাহায্য করতে পারা যায় কাব্য শিল্পের মাধ্যমে... তাই আজ একান্ত প্রয়োজন একটি কর্মক্ষেত্রর সুযোগ গড়ে তোলার, সেখানে শিল্পীরা তাদের গভীর অনুভবের রচনাকে সাধারণের কাছে সৎভাবে উপস্থিত করতে পারবেন। এই আবেদনপত্রে যাঁরা সই করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন উদয়শঙ্কর, অন্নদাশঙ্কর রায়, সত্যজিৎ রায়, শম্ভু মিত্র, আলি আকবর খান, বিষ্ণু দে প্রমুখ। এই কর্মক্ষেত্র শেষ পর্যন্ত তৈরি হয়ে উঠতে পারেনি সরকারি উদাসীনতায়। বস্তুত ছয়ের দশকে বারবার আক্রান্ত হয়েছে নাট্যশালা। ১৯৬২ সালে নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হলো, ১৯৬৬ এবং ১৯৬৯ সালে নতুন কর বসানোর চেষ্টা হলো, পুলিশ দিয়ে নাট্যাভিনয় বন্ধ করা বা নাট্যজনকে গ্রেপ্তারের ঘটনাও বাদ যাচ্ছে না।

ছয়ের দশককে বাংলা নাট্যশালার স্বর্ণযুগ বললে খুব ভুল কিছু করা হবে বলে মনে হয় না। বহুরূপীর রাজা এবং রাজা অয়দিপাউস, লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের ফেরারী ফৌজ, ওথেলো, কল্লোল, নান্দীকারের মঞ্জরী, আমের মঞ্জরী, শের আফগান, তিন পয়সার পালা এবং আরো বহু নাটকের নাম বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে চিরায়ু হয়ে আছে। যে কটি নাম করা হলো তার বাইরে আরো বহু সক্ষম প্রযোজনা আছে তা জানিয়ে রাখা উচিত। লক্ষ করতে বলব, এদের মধ্যে একটা বড় অংশ বিদেশী নাটকের অনুবাদ। প্রাচীন গ্রিক নাটককার সফোক্লিস থেকে শেক্সপীয়র, চেখফ থেকে বার্টল্ড ব্রেখট, সকলকেই সাদরে ডেকে নিচ্ছে গ্রুপ থিয়েটারের অঙ্গন, বিশ্বনাট্যের সঙ্গে ভাবনার সেতু তৈরি হয়ে উঠছে এইভাবে। বলা চাই রবীন্দ্র নাটকের প্রযোজনার কথা। জন্মশতবর্ষের দশকে বহুরূপী করলেন বিসর্জন আর রাজা, তরুণ রায়ের নাট্যগোষ্ঠী মুখোশ ১৯৬৫ সালের মে মাসে রবীন্দ্র কাননে প্রযোজনা করলেন প্রায়শ্চিত্ত, নির্দেশনার কাজ করেছিলেন সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১৯৫৫ সালে বহুরূপী ভেঙে তৈনি হয় রূপকার, ছয়ের দশকে পরপর কয়েকটি রবীন্দ্র প্রযোজনা করেন তাঁরা, যেমন ৬০ সালে ত্যাগ, ৬১তে জীবিত ও মৃত, ৬২তে কালের যাত্রা, ৬৪ সালে ডিটেকটিভ, ৬৬তে অচলায়তন। বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি নানা নাট্যদলের সমাহারে প্রযোজনা করছেন রক্তকরবী, মুদ্রারাক্ষস এবং তুঘলক, প্রকাশিত হচ্ছে গন্ধর্ব থিয়েটার এবং অভিনয় নামে নাট্যবিষয়ক পত্রিকা।

এই বাংলায় সাতের দশক শুরু হল প্রবল রাজনৈতিক অস্থিরতা দিয়ে। ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করল। পাশেই বাংলাদেশে তখন চলছে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ, ভারতীয় সেনাবাহিনী সে যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে, সাধারণ নাগরিকেরাও তাই। দার্জিলিঙের এক ছোট্ট গ্রাম থেকে জন্ম নেওয়া নকশাল আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে গোটা বাংলায়, শহর কলকাতার তরুণেরা ঝাঁপিয়ে পড়ছেন সেই লড়াইয়ে, সুশিক্ষিত পুলিশ মিলিটারি আর গুন্ডাদের সঙ্গে অসম যুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ অন্ধ্র বা ছত্তিশগড়ের বেশ কিছু অংশ ধুয়ে যাচ্ছে তাজা রক্তে। ১৯৭৫ সালের ২৫ মে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হলো। ৭৭ সালে সাধারণ নির্বাচনে সরকার গড়ল ভারতীয় জনতা পার্টি।

পেশাদার থিয়েটার চলছে তার পুরনো নিয়মেই। বিশ্বরূপা বিমল মিত্রের লেখা বৃহদায়তন উপন্যাসগুলির নাটকরূপ মঞ্চস্থ করতে লাগল, মালিক রাসবিহারী সরকার তাঁর নাটকে নিয়ে এলেন উত্তেজক ক্যাবারে নাচ। পেশাদার মঞ্চের সব কর্তৃপক্ষই যে এমন পথ নিয়েছেন তা নয়, সংঘাতময় পুরনো ধরনের গল্প নাট্যের আকারে বলছেন তাঁরা, স্টারে শুরু হল সমাধান, মহেন্দ্র গুপ্তের অভিনয়ধন্য সে নাটক দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গনায় করছেন অকিঞ্চিৎকর জয় মা কালী বোর্ডিং,

প্রায় একার অভিনয়ক্ষমতায় সে নাটককে জনপ্রিয় করে তুলছেন। কিন্তু এরই মধ্যে লাগতে শুরু করল পরিবর্তনের আঁচ। কাশী বিশ্বনাথে এলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তাঁর পরিচালনায় পেশাদার থিয়েটারের চালু ছকে বড় রকমের ধাক্কা এল। এর উল্টোমুখে, চতুর্মুখ নাট্যদল অসীম চক্রবর্তী আর কেতকী দত্তকে নিয়ে বারবধূ প্রযোজনা করল, ব্লো হট নাটকের তকমা দিয়ে প্রচুর ব্যবসা করল সে নাটক।

যাকে বলি গ্রুপ থিয়েটার বা অন্য থিয়েটার, তার সম্পর্কে মানুষের ঔৎসুক্য বাড়ছিল, ছয় বা সাতের দশকে এই ধারাটিই হয়ে উঠেছিল বাংলা নাট্যের প্রধান ধারা। লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ মিনার্ভায় নিয়মিত অভিনয়ের চেষ্টা করেছিলেন, আর্থিকভাবে তার ফল ভালো হয়নি। হয়তো সে কথা মনে না রেখে নান্দীকার সত্তর সাল থেকেই রঙ্গনায় নিয়মিত অভিনয় শুরু করলেন। কেয়া চক্রবর্তীর অবিস্মরণীয় অভিনয়ের সম্পদ নিয়ে ভালো মানুষের বেশ কিছু অভিনয় হয়েছিল এই মঞ্চে, সাতাত্তরে কেয়া প্রয়াত হলেন দুর্ঘটনায়। বহুরূপী নিয়মিত অভিনয় শুরু করল অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে, আজ যাকে বাংলা থিয়েটারের পীঠস্থান বলে প্রচার করা হয়ে থাকে। বেশ কিছু নাটকের দল ভেঙে যাচ্ছে এই দশকে। লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ ভেঙে হল পিপ্‌লস লিট্‌ল থিয়েটার, সেই নতুন দল প্রযোজনা করল উৎপল দত্তের টিনের তলোয়ার, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ এবং জনপ্রিয় বাংলা নাটকের মধ্যে অন্যতম। বহুরূপী থেকে বেরিয়ে এলেন শম্ভু মিত্র, শাঁওলী বা তৃপ্তি মিত্রও তাঁদের পুরনো দলের সংশ্রব ত্যাগ করলেন, কুমার রায় উঠে এলেন নির্দেশনা দেবার কাজে। নান্দীকার থেকে বেরিয়ে এলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, তৈরি করলেন নান্দীমুখ।

তবে বলে রাখা দরকার, দল ভাঙার এই বিচ্ছিন্নতাই এ দশকের একমাত্র অভিজ্ঞান নয়, দলগুলো জোট বাঁধার প্রয়োজনও বোধ করছিল একই সঙ্গে। আশির একেবারে গোড়ায় শম্ভু মিত্রকে কেন্দ্রে রেখে কলকাতা নাট্যকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা। জার্মান ন্যাশনাল থিয়েটার, ভাইমারের নির্দেশক ফ্রিৎস বেনেভিৎসকে দিয়ে ব্রেখটের গালিলিওর জীবন নাটকের প্রযোজনা করা হল, বহুরূপী এবং পি. এল. টি. ছাড়া কলকাতার প্রায় সব কটি প্রধান দলের খ্যাতিমান অভিনেতারা একসঙ্গে মিলে করলেন এই কাজ। ঠিক একই সময়ে গালিলিও নামে বহুরূপী প্রযোজনা করল ওই একই নাটক। দুটি প্রযোজনার তুলনা হতে লাগল, এমনকি কলকাতার রাস্তায় হোর্ডিং পড়ে গেল কোন্ প্রযোজনাটি ভাল তাই নিয়ে মতামত চেয়ে। গিরিশচন্দ্র অমরেন্দ্রনাথদের সময় বুঝি ফিরে এলো আবার।

থিয়েটারকে কি পেশা হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব? ছয়ের দশকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, আরো নানা অভিকর শিল্পের মতো নাট্য সংক্রান্ত নানা বিদ্যাও শেখানো হয় সেখানে। অভিনয়কে যাঁরা পেশা হিসেবে নিয়েছেন তাঁরা থিয়েটার বহির্ভূত নানা অভিনয় কাজে থেকে পয়সা রোজগার করছেন, কিন্তু তাতে

কি থিয়েটার পেশাদার হলো? ১৯৭৭ সালে দেশ পত্রিকায় বাংলা থিয়েটার ও সরকারি দায়িত্ব নামে লেখায় রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত চাঁচাছোলা ভাষায় বললেন, সবিতাব্রত দত্ত, শেখর চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি ঘোষ প্রমুখ নির্দেশকেরা এখন নিয়মিত পেশাদারী মঞ্চের অভিনেতা নয়তো কাণ্ডারী। শ্যামল ঘোষ অসিত বসু এবং বীর সেন নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভুলে যাত্রায় নেমেছেন। অমর গাঙ্গুলী আমেদাবাদে সঙ অ্যান্ড ড্রামা ডিভিসনে গুজরাতি ভাষায় পরিবার পরিকল্পনার নাটক করছেন। বিভাস চক্রবর্তী কলকাতা দূরদর্শনের কাজে ব্যস্ত। অসীম চক্রবর্তী ব্রাসিয়ারের বিজ্ঞাপন দেখিয়ে বারবধূকে এশীয়-রেকর্ডের পথে নিয়ে যাচ্ছেন।... তালিকা আরো দীর্ঘ, কিন্তু সংক্ষিপ্ত এই নিরূপায়তা থেকে একদিকে যেমন অভিনয় করেই গ্রাসাচ্ছাদনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাচ্ছে অন্যদিকে তেমনি আমাদের বাংলায় তার অসম্ভাব্যতাও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

সাতের দশক বহুরূপীর পক্ষে ভালো সময় নয়। শম্ভু মিত্র নির্বাণোন্মুখ, পাগলা ঘোড়া বা চোপ! আদালত চলছে, কোনো অবস্থাতেই তাঁর পুরনো প্রযোজনাগুলির বৈভব স্পর্শ করতে পারল না। তৃপ্তি মিত্রের নির্দেশনায় তাঁরই একক অভিনয়ে অপরাজিতা অবশ্য প্রবল জনপ্রিয়তা পেল। বেশ কিছু এলোমেলো কাজের পর ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে কুমার রায় নির্দেশিত মৃচ্ছকটিক নিয়ে শাপমুক্তি ঘটল তাঁদের। দক্ষিণপন্থী রাজনীতির আগ্রাসন ক্ষিপ্ত করে তুলেছে উৎপল দত্তকে, জরুরি অবস্থাকে নিয়ে পি. এল. টি. করছে এবার রাজার পালা, দুঃস্বপ্নের নগরীতে তো বটেই, টোটা এবং ব্যারিকেডেও সময়ের চাপ পড়ছে গাঢ় রঙে। সুন্দরম করল সাজানো বাগান, জমিতে যে ফসল ফলায় আর সে জমি যে কেড়ে নিতে চায় তাদের বিরোধকে দেখানো হলো আশ্চর্য ফ্যান্টাসিতে মুড়ে। এ নাটকও চিরকালীনতাকে ছুঁয়ে ফেলতে পারল। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নতুন দল নান্দীমুখে করলেন টলস্টয়ের পাওয়ার অফ ডার্কনেসের অনুসরণে পাপপুণ্য-- থিয়েটার ওয়ার্কশপ করছেন মনোজ মিত্রের চাক ভাঙা মধু, থিয়েটার কমিউন প্রেমচন্দ অনুসারী দানসাগর। শহরের আওতা থেকে বেরিয়ে বৃহত্তর এই দেশকে স্পর্শ করতে চাইছে এইসব নাটক। এক দশকে এতগুলি গর্ব করার মতো প্রযোজনা হতে পারল বাংলা থিয়েটারে, এ বড় কম কথা নয়। বোঝা যাচ্ছে, এই থিয়েটারের ধারা সামূহিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠছে, একটি দুটি দলের চূড়াস্পর্শী কাজ নয়, বহু দলের বহু ধরনের ভালো কাজের সমাহার ঘটছে বাংলার নাট্যাঙ্গনে। আবার, থিয়েটারের এই চেনা ছকের বাইরে বেরিয়ে এলেন বাদল সরকার। তাঁর দল শতাব্দী প্রত্যাখ্যান করল প্রসেনিয়মের নিয়ম মতো দর্শক বনাম নাট্যশিল্পীদের বিভাজন। দর্শক বসবেন অন্ধকারে অভিনেতা থাকবেন আলোয়, দর্শক থাকবেন নিচে আর অভিনেতা ওপরে, এবং সর্বোপরি, দর্শকের দেওয়া টিকিটের দামের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে তাঁদের বসবার আসন-- বেশি টাকা দিলে সামনে আর

কম টাকা দিলে পেছনে-- এই নিয়মকে অগ্রাহ্য করে এক নাট্যপ্রচেষ্টা শুরু হলো, যার মূল হয়তো আছে আমাদের লোকনাটকে, আছে প্রচার নাটক বা পথ নাটকের মধ্যে। সরকারি আনুকূল্য পাওয়া যাচ্ছে এখন, প্রতিষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অকাদেমি, নাটকের মানুষজন মিলে সেখানে তৈরি করবেন থিয়েটার সম্পর্কিত নানা কৃৎকৌশল।

ভুলে যাওয়া অন্যায় হবে, নাট্যচর্চার একটি জোরালো ধারা বয়ে চলেছিল আলোকিত মঞ্চগুলির বাইরে, মফস্বলে এমনকি গ্রামবাংলায়। সেখানে একাঙ্ক নাটকের প্রতিযোগিতা হয়, তাতে দুরন্ত প্রযোজনা করেন বেশ কিছু দল, তাঁদের খবর মিডিয়া লালিত বাঙালি দর্শক রাখেন না। ষাটের শেষ এবং সত্তরের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই দলগুলি রাজনৈতিক থিয়েটারকে দিকে দিগন্তরে ছড়িয়ে দিয়েছে। শুধু একাঙ্ক নাটক নয়, তন্নিষ্ঠ বেশ কিছু নাট্যকর্মের কথা বলা যায় যাঁদের অত্যন্ত দামি কাজও ইতিহাসে জায়গা পেল না। বলা উচিত লোকনাটকের বিচিত্র ধারাগুলির কথা, কেমন করে সময়ের ছাপ মেখে তারা নতুন মানে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে তাও গভীর অনুধ্যানের বিষয়। কিন্তু নিবন্ধকারকে এক সময়ে থামতেই হয়, তার এই সর্বার্থে অসম্পূর্ণ লেখা কখনো কোনো গবেষককে উত্তেজিত বা উদ্বুদ্ধ করবে এমন আশা নিয়ে।